বাংলা (ষষ্ঠ পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ২

একক ৪ ☐ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'

পর্যায় ২ একক ৪

৪.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

৪.১ আলোচনা

৪.২ ট্র্যাজেডি বিচার

৪.৩ নামকরণ

৪.৪ নায়কবিচার

৪.৫ সংলাপ

৪.৬ সঙ্গীত

৪.৭ চরিত্র বিচার ঃ সাজাহান, ঔরংজীব, দারা, দিলদার, মোরাদ, সুজা, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিং। জাহানারা, নাদিরা, পিয়ারা, মহামায়া।

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাট্যকারই নন, তিনি কবি ও সঙ্গীতকার রূপেও স্মরণীয়। স্বদেশি আন্দোলনের ভরা জোয়ারের কালে দ্বিজেন্দ্রলাল [১৮৬৩-১৯১৩] সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হন ও সার্থকতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য হলো মার্জিত মনন, উচ্চাঙ্গের শিল্পচেতনা, বৈদগ্ধ্য, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও উন্নত রুচি। দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত নাটকগুলি যথাক্রমে ঃ কল্কিঅবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), পাষাণী (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), তারাবাঈ (১৯০৩), প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), পুনর্জন্ম (১৯১১), পরপারে (১৯১২), আনন্দবিদায় (১৯১২)। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তিনটি নাটক ভীষ্ম (১৯১৪), সিংহলবিজয় (১৯১৫), বঙ্গনারী (১৯১৬) প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকলার নিম্নোক্ত শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. প্রহসন ঃ কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম ও আনন্দবিদায়। [আনন্দবিদায় ব্যতীত অন্যান্য প্রহসনগুলি সুরুচিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন।]

খ. পুরাণকেন্দ্রিক ঃ পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম।

গ. সামাজিক ঃ পরপারে, বঙ্গনারী।

ঘ. ঐতিহাসিক ঃ তারাবাঈ, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহলবিজয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনরচনার বিষয়বস্তু হলো নানা সামাজিক অসঙ্গতি, সংকীর্ণতা, নারী সমাজের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা, প্রেম, বিবাহ-সমস্যা ইত্যাদি। চাতুর্যপূর্ণ সংলাপ, কৌতুককর পরিস্থিতি ও হাসির গান তাঁর প্রহসনের সম্পদ।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হলো অলৌকিকতা বর্জন ও ভক্তির দিক অস্বীকার। তবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'সীতা' বিশেষভাবে সফল নাটক। সামাজিক নাটক 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' চরিত্রসৃষ্টি, নাট্য পরিস্থিতি ও সংলাপ কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য। এই শ্রেণির নাটকগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, ট্র্যাজিক পরিণতি, সংলাপ রচনা, সঙ্গীত প্রয়োগ ইত্যাদি তাঁকে খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের প্রচারের সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবপ্রেমের কথাও আছে।

৪.১ আলোচনা

ঐতিহাসিক নাটক ও সাজাহান ঃ

ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে নাটকরূপে সার্থকতা অর্জন করাই ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষত্ব। নাটকরূপে ব্যর্থ অথচ ঐতিহাসিক উপাদানের প্রয়োগে সার্থক হলেও তা ঐতিহাসিক নাটক হবে না। 'ইতিহাসের বিশেষ সত্য' ও 'সাহিত্যের নিত্য সত্য' যদি উভয়ই সমানুপাতে রক্ষিত হয় তবেই ঐতিহাসিক নাটক সার্থক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের দাবি মেটানোই ঐতিহাসিক নাটকের কাজ নয়; কল্পনাশক্তি না থাকলে ঐতিহাসিক নাটক নীরস তথ্যসর্বস্ব ইতিহাসে পরিণত হতে পারে। আসলে ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের রস বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনায় বলেছেন ঃ "সাধারণ ইতিহাসের একটি গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া ওঠে, কিন্তু সেই রথ চক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্ত ধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; হয়ত সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।" আসলে ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস ও মানবজীবন উভয়কেই একত্রিত করতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে যুগের আবহ, আচরণ, স্বরূপ, প্রকৃতি ইত্যাদিও চিত্রিত করতে হবে। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়, নাটক। ইতিহাস বহিরাশ্রয়ী ঘটনাবৃত্তের পরিচয় দেয়; মানুষের অন্তর্জীবনের পরিচয় দেওয়া ইতিহাসের কাজ নয়। ইতিহাসের তথ্য সমাহৃত করে মানবরসের উদ্বোধন ঘটাতে হবে। নাট্যকারের

সৃজনী কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের নীরস তথ্যকে জীবনরসে মণ্ডিত করতে হবে। সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে হলে ইতিহাসের স্বরূপ, প্রকৃতি, তার মর্মরহস্য, বিপুল প্রবাহ ইত্যাদিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে। তা অনুভূতির সত্যে পরিণত হবে। ইতিহাসের বিশেষ সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করতে হবে। ইতিহাসের রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে মানবজীবনের ভাব, প্রেম, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্তই সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হবে। ঐতিহাসিক রসসঞ্চারের নিপুণতার উপরেই ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা নির্ভরশীল।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি মোগল সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কালপর্বকে কেন্দ্র করে রচিত। এই কালপর্ব হলো সপ্তদশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত। সাজাহান বৃদ্ধ হলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কূটকৌশলে, ধূর্ততায় ও নৃশংসতার ঔরংজীব দারা, সুজা, মোরাদকে পরাজিত বা হত্যা করে সাজাহানকে বন্দি করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ক্ষমতালোভী ঔরংজীব পিতা সাজাহানকে অন্তরীণ করে প্রতিকূল শক্তিকে উৎপাটিত করেন এবং সততার আবরণে নিজেকে আবৃত করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইতিহাসের এই বিষয়কে কেন্দ্র করে 'সাজাহান' নাটকটি রচিত; ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে এখানে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

'সাজাহান' নাটকের ঐতিহাসিক উপাদানের উৎস ঃ যদুনাথ সরকারের HISTORY OF AURANGZIB (VOL. I), A SHORT HISTORY OF AURANGZIB, ডাচ রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৬৬১, ANNALS AND ANTIQUITIES OF RAJASTHAN. (VOL. II), নিকোলাই মানুচির বিবরণ, যদুনাথ সরকারের History of Bengal, এবং STUDIES IN AURANGZIB'S REIGN গ্রন্থ।

সুজার বঙ্গদেশে বিদ্রোহ, গুজরাটে সম্রাটরূপে মোরাদের ঘোষণা, দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীবের যোগদান ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাস সমর্থিত।ষ আলোচন্য নাটকের ১/২, ১/৭, ২/৩, ৩/১, ৩/৩, প্রভৃতি অঙ্ক ও দৃশ্যে যে সমস্ত ঘটনা, ঘটনার ইঙ্গিত বা পরিণাম আছে তা সমস্তই ইতিহাস সমর্থিত। ধর্মাটের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের পরাজয়, শামুগড়ের যুদ্ধে দারার পশ্চাদ্ধাবন, আমেদাবাদের শাসনকর্তাকর্তৃক দারাকে আশ্রয়দান ইত্যাদি ঘটনারও সমর্থন ইতিহাসে মেলে। তবে দিলার খাঁ সোলেমানের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিনা তা ঠিকমত জানা যায় না। জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের ভূমিকা যে যথাযথ সে বিষয়ে সংশয় নেই।

নাটকের কাহিনি ব্যতীত চরিত্রাঙ্কনের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সেখানেও ইতিহাস যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকে দারা পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল পিতা ও পত্নীপ্রেমী স্বামীরূপে যেভাবে চিত্রিত তা ইতিহাস সমর্থিত সূজার সঙ্গীতপ্রিয়তা ও লঘুচিত্ততা ইতিহাসবিরোধী নয়; তবে পিয়ারা চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। মোরাদের সঙ্গে ঔরংজীবের চুক্তি ইতিহাসসম্মত। নাটকে নারীচরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জাহানারা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার জন্য ইতিহাসে স্মরণীয়। দিলদার চরিত্রের উপস্থাপনা নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। এই চরিত্রের পটভূমিকায় সামান্যতম ঐতিহাসিকতা ছিল কিনা তা বিতর্কিত। নাটকে যে নিয়ামৎ কাঁ হাজীকে এশিয়ার সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞতম সুধী বলা হয়েছে সেজাতীয় নাম ইতিহাসে অনুপস্থিত; তবে ইতিহাসে দানিশমন্দ খাঁ নামটি পাওয়া যায়।

'সাজাহান' নাটকে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে ঐতিহাসিকতা অনুসৃত হয়েছে। নাট্যকার কোথাও ইতিহাসকে অতিক্রম না করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দারা নাদিরার দাম্পত্যজীবন, সুজা-পিয়ারার দাম্পত্য অন্তরঙ্গতা, পিতা সাজাহান ও কন্যা জাহানারার পারিবারিক বন্দিদশা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাজাহানের স্নেহদুর্বলতা, পুত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, নানা উন্মত্ততা, শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতক ঔরংজীবকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি নাট্যকার ইতিহাসের ইঙ্গিতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য মানবহৃদয়ের অন্তর্বিরোধ প্রদর্শন এবং এ ব্যাপারে নাট্যকারের দক্ষতা অতুলনীয়। ইতিহাসের তথ্যের সাহায্যে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে নাট্যায়িত করার ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সমস্ত মিলিয়ে 'সাজাহান' একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটকরূপে স্মরণীয়।

৪.২ ট্র্যাজেডি বিচার

পাশ্চাত্য সাহিত্যে অ্যারিস্ততল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক কালের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে ট্র্যাজেডির দুজাতীয় শ্রেণিভেদ লক্ষ্যগোচর—গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তি মানবচরিত্রের নিয়ন্তা; কিন্তু শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি তার জীবনকে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। মানুষের চরিত্রের মধ্যে তার পতনের বীজ আত্মগোপন করে থাকে। পূর্বতন ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা থাকলেও আধুনিক কালে ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা অপরিহার্য নয়। অ্যারিস্ততল মনে করতেন, করুণা ও ভয় জাগ্রত করাই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। কিন্তু একালের নাট্যতত্ত্ববিদ্ নিকল মনে করেন, বিস্ময়বিমূঢ়তার আবেগ জাগানোই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। ট্র্যাজেডির নায়কের পতন হয় তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকে। নায়ক চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতার পথ ধরে জীবনে শনি প্রবেশ করে এবং তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত আলোচনার পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে—ট্র্যাজেডি কার, ট্র্যাজেডি কেন এবং কী ধরনের ট্র্যাজেডি অর্থাৎ তা ঘটনাগত না চরিত্রগত। কেউ কেউ মনে করেছেন, দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজেডি, চূড়ান্ত ঘটনা। দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাটক শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা, যাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনাবর্ত গ্রথিত তিনি সাজাহান, দারা নন। দারার বিপর্যয় নাটকের নানা বিপর্যয়ের অন্যতম; কিন্তু সাজাহানের জীবনে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। দারার মৃত্যু সাজাহানের জীবনের বহু বিপর্যয়ের একটি; কেননা, দারার মৃত্যুতে স্নেহপ্রবণ সাজাহান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অর্ধোন্মাদে পরিণত হয়েছেন। দারা যদি ট্র্যাজেডির লক্ষ্য হতেন তাহলে নাট্যকার সাজাহান চরিত্রের বিকার দেখাতেন না। পঞ্চমাঙ্কে সাজাহানের অন্তর্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার পরিণতি সাজাহান চরিত্রকে যে ট্র্যাজিক মর্যাদা দিয়েছে, দারার চরিত্রে অন্তর্দাহের সে তীব্রতা

নেই। সুকুমার সেন মনে করেন ঃ 'ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা খুব আছে বলিয়া মনে হয় না। সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ..... নাটকটির নাম জাহানারা হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত।" কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, জাহানারা চরিত্রের 'ডুয়িং এ্যান্ড সাফারিং'-কে ঘিরে নাটকটি রচিত নয়। জাহানারা বলিষ্ঠ চরিত্র হলেও ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। অতএব জাহানারা ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র নন।

আবার নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষের মতে ঃ "প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনির মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি ঔরংজীব। ..... ঔরংজীবের কুটিল নিষ্ঠুর চক্রান্ত ..... অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহারা যেন নিরুদ্ধ হাহাকারে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে।" ঔরংজীব সক্রিয় চরিত্র, বহু চরিত্রের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ঔরংজীব, তিনি দ্বন্দ্বহীন নন—এ সমস্ত কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, সার্থক ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে যতখানি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেকের দংশন থাকা উচিত, ঔরংজীবের তা নেই। আসলে ট্র্যাজেডি ঘটেছে সাজাহান চরিত্রে। সাজাহান যেন শেক্সপীয়রের কিং লিয়রের মত ট্র্যাজেডি অব সাফারিংস-এর প্রতীক। সাজাহান বাইরের দিক থেকে সক্রিয় না হলেও তাঁর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব ঘটে নি। তাঁর স্নেহাতিশয্যের দুর্বলতার পথে ট্র্যাজেডি গভীরতর হয়েছে। দুঃখভোগের চিত্রবর্ণনাই ট্র্যাজেডি নয়। চরিত্রের কোন দুর্বলতার ছিদ্রপথে সেই দুঃখ এলো তা জানতে হবে। পিতা সাজাহান স্নেহাতিশয্যের জন্য পুত্র ঔরংজীবের প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। এই দুর্বলতার পথ ধরেই সাজাহানের জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে এসেছে। ঘটনার বহিরঙ্গ সংঘাতে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের দিকটি সাজাহান চরিত্রে সংলক্ষ্য। সাজাহান আদৌ নিষ্ক্রিয় চরিত্র নন। নাটকের সমাপ্তিতে সাজাহানের মৃত্যু ঘটেনি; ক্ষমাপ্রার্থীত্র ঔরংজীবকে ক্ষমা করে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য সাজাহানের ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনা ক্ষুন্ন হয় নি; সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত সাজাহান। একদিকে দারা, সুজা ও মোরাদের পিতারূপে পুত্রবেদনায় অধীর; অন্যদিকে পুত্রঘাতী পুত্র ঔরংজীবের জন্য পিতৃহৃদয়ের অপার ক্ষমতা—এই হলো সাজাহানের বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী চিত্র।

সুতরাং দেখা গেল, সাজাহানের ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। সাজাহানের মত ট্র্যাজিক নায়কের বিরাটত্ব ও মহনীয়তা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তাঁর পতনে ও বিপর্যয়ে পাঠক/দর্শক ভয়চকিত বিহবলতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। সাজাহানের বিপর্যয় তাঁর চারিত্রিক মহিমা বা গৌরবকে ম্লান করে না। সাজাহান নাটক শুধু সার্থক ট্র্যাজেডি নয়, সাজাহান চরিত্রটিও ট্র্যাজিক নায়কের উপযোগী। 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম কীর্তি।

৪.৩ নামকরণ

সৃজনশীল সাহিত্যবস্তুর নামকরণ কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিনিয়মের বাঁধা পথে চলে না। সাধারণভাবে রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নামকরণের মাধ্যমে প্রকটিত হয়। নামকরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ঘটনাকেন্দ্রিক, ব্যঞ্জনাকেন্দ্রিকও হতে

পারে। তবে শিল্পী নামকরণের ক্ষেত্রে মূলত ব্যঞ্জনাধর্মিতার প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করেন।

'সাজাহান' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল মনে করেন, 'সাজাহান' নাটকের নামকরণ যথার্থ; নাট্যকারের মূল বক্তব্য আলোচ্য নামের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঔরংজীব; অতএব তার নামেই নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। আবার অনেকে মনে করেন, জাহানারা আলোচ্য নাটকের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সক্রিয় চরিত্র বলে নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল জাহানারার নামে। সুতরাং প্রত্যেকটি মত বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

'সাজাহান' নাটকের প্রধান চরিত্র কোনটি তা বিচারের উপর নাটকের নামকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ হবে। মনে রাখতে হবে, কেবল কতকগুলি দৃশ্যের উপস্থাপনাকেই নাটক বলে না। দৃশ্যগুলি সংলগ্নভাবে রচিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে. নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হবে। বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যাদির সমাবেশে নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলেন। ঘাত-সংঘাতের মাধ্যমেই নাটকের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। দুই বিপরীত শক্তির একদিকে থাকে নাট্যকারের বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যম বিশেষ চরিত্রটি ও তাকে পরিস্ফুট করার জন্য পার্শ্ব চরিত্র ও ঘটনাবলী। অন্যদিকে থাকে সেই চরিত্রটি যে বিরোধিতার মাধ্যমে নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের বাহন। প্রথম ক্ষেত্রের প্রধান চরিত্র নায়কূরপে পরিগণিত হন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উল্লিখিত চরিত্রকে প্রতিনায়ক বলা হয়। কোনো চরিত্র যদি তার সক্রিয়তার দ্বারা ও বুদ্ধি কৌশলে নাটকে প্রাধান্য বিস্তার করে তবে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক বলা যাবে না। এমনকি নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক হলেও নাটকের প্রকৃতি বিচারে মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে না।

'সাজাহান' নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে সাজাহানের জীবনের শেষ আট বছরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। এই আটটি বছর পারিবারিক ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কলঙ্কিত অধ্যায়। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, মোরাদ ও ঔরংজীব আপনাপন স্বার্থ ও হানাহানিতে মগ্ন। কিন্তু সাজাহানের কাছে সকল পুত্রই সমান স্নেহাস্পদ। দারাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালেও পিতা সাজাহানের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। আবার জাহানারাকে ভ্রাতৃবিরোধে না জড়াতে অনুরোধ করেছেন। সুতারং 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো সাজাহানের সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্ব। পরিণতিতে সাজাহানের সম্রাটসত্তা পরাজিত হয়েছে ও পিতৃসত্তা জয়লাভ করেছে। 'সাজাহান' নাটকের মূল বক্তব্যও তাই। সাজাহান বহিরঙ্গ আচরণে ঔরংজীবের মতো ক্রিয়াশীল না হলেও নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সাজাহানই আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অতএব সাজাহানের নামে নাটকের নামকরণ সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের দৃশ্যযোজনা, উপস্থাপনা ও আঙ্গিকগত কৌশল উক্ত বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়। সুতরাং দারা, ঔরংজীব অথবা জাহানারা কেন্দ্রিক নামকরণ সঙ্গত হতো না। সাজাহানের নামে নাটকটির নামকরণ সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে।

৪.৪ নায়কবিচার

নাটকের ঘটনা ও পরিণতি যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা হয়। 'সাজাহান'

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, ঔরংজীব কেন্দ্রীয় চরিত্র; আবার কারোর মতে, জাহানারা চরিত্রের সক্রিয়তা অনেক বেশি। ঔরংজীব চরিত্রকে যাঁরা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা প্রদান করতে চান তাঁরা বলেন, 'ঔরংজীবই কাহিনির মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়াছেন।'

'সাজাহান' নাটকটি যদি ট্র্যাজেডি হয় এবং ঔরংজীব যদি নায়ক হন তাহলে ঔরংজীবের ট্র্যাজেডি প্রদর্শন নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গেলে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, ঔরংজীব চরিত্রে সেগুলি কতখানি প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া দরকার। ঔরংজীবের কূটবুদ্ধির বার বার জয়লাভ এবং শেষ পর্যন্ত সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দর্শকচিত্তে তাঁর প্রতি কোনো করুণা বা সহানুভূতি জাগ্রত করে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। ট্র্যাজেডি নায়কের বিভিন্ন প্রকার সদগুণের সঙ্গে একটি দুর্বলতার ছিদ্র থাকে যার ভিতর দিয়ে বিপর্যয় নেমে আসে। ঔরংজীব নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য একে একে ভ্রাতৃহত্যা করেছেন, পিতাকে কারারুদ্ধ করেছেন। এমনকি নিজের পুত্রকেও ঔরংজীব বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর কার্যকলাপ দর্শকচিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে নি; আবার ঔরংজীবের জীবনে এমন কিছু বিপর্যয় ঘটে নি যা পাঠক-দর্শকচিত্তে করুণা জাগ্রত করতে পারে। অতএব ঔরংজীবকে নায়কের মর্যাদা প্রদান করা যায় না।

ঔরংজীব বাইরের দিক থেকে নাটকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও, নাট্যকার 'সাজাহান' নাটকে যে বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন তা সাজাহান কেন্দ্রিক। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্বই এ নাটকের মুখ্য বিষয়। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পুত্রদের প্রতি স্নেহাতিশয্য সাজাহানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাঁর স্বকৃত ভুলের জন্যই নাটক ট্র্যাজেডির পথে ক্রমাগ্রসরমান। দারাকে অন্যান্য পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়ে সম্রাট সাজাহান তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন সত্য, কিন্তু পিতা সাজাহান ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ইন্ধন যুগিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এবং দর্শকদের চিত্তে সহানুভূতি জাগিয়েছেন। সাজাহানের বন্দিদশার কারণ স্নেহাতিশয্য; পুত্রদের মৃত্যুজনিত শোকের আঘাতও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কাহিনিতে বারবার সাজাহানকে অবলম্ভবন করেই নাটকের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি। ঔরংজীবের জয়লাভ, বিবেকের দংশন বা মার্জনা ভিক্ষা কোনটা দেখানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বে ও ট্র্যাজিক পরিণতি প্রদর্শন। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব এবং তাঁর বিকাশ ও পরিণতিকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়, এক পুত্রের অকৃতজ্ঞতা, অন্যপুত্রদের মৃত্যু—একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত সাজাহান শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির এক নায়ক। বৃদ্ধ সাজাহানের আট বছরের করুণ ট্র্যাজিক জীবন চিত্রিত করাই 'সাজাহান' নাটকের লক্ষ্য বলে সাজাহানকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে হবে।

ট্রাজেডির নায়ককে সব সময় যে বহিরঙ্গভাবে সক্রিয় থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাজাহানের সংগ্রাম বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা নিজের দুটি সত্তার মধ্যে। তাই সাজাহানের চিন্তায় আত্মরক্ষাপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! তাঁর সমস্যা হলো—যে পক্ষেরই পরাজয় হোক্ না কেন তাতে তাঁরই ক্ষতি। তাঁর জীবনের পরিণতি হলো সন্তানদের ম্লান মুখ দেখা। দারা, সুজা, মুরাদ এবং ঔরংজীব সকলেরই অন্তিম পরিণতির সর্বশেষ আঘাত বহন করতে হয়েছে সাজাহানকে। ফলত, সাজাহানই আলোচ্য

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

৪.৫ সংলাপ

সংলাপ নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সংলাপ ব্যতীত নাটক গড়ে উঠতে পারে না। কাহিনির অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দায়িত্ব সংলাপকে বহন করতে হয়। সংলাপের সাহায্যে নাটকের পটভূমি যেমন আলোকিত হয়, তেমনি নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যও সংলাপের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। সংলাপ ব্যতীত নাটকের হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ কাব্যধর্মী। বহিরঙ্গে তাঁর সংলাপ গদ্যবাহিত হলেও অন্তরঙ্গে তা কাব্যমণ্ডিত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় অধিকাংশ নাটকের সংলাপ তাঁর কবিধর্মের দ্বারা চলিত। সংলাপ যদি অধিক পরিমাণে কাব্যধর্মী হয়, তাহলে সেখানে নাটকীয়তা হারিয়ে যায়। যেমন, তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সোলেমনের সংলাপ—"সুন্দর এই দেশ! যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য।" আবার কাশ্মীরি নর্তকীদের কাছে সোলেমানের উক্তি যেন নৈতিক বক্তৃতার ন্যায়—"তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার আংটি, কর্পেটের জুতো, হাতির দাঁতের ছড়ি।" দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের অনেক চরিত্রই এমন কাব্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন যে, নাটকীয়ত্ব অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয় নি। আবার বিপরীত দিকে পঞ্চমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ঝটিকাবিদ্যুৎময় রাত্রে আগ্রা দুর্গে বন্দি সাজাহানের সংলাপ অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বমথিত, নাটকীয় সার্থকতা-মণ্ডিত—"ইচ্ছে কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটে বেরোই। ইচ্ছে কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই।"

'সাজাহান' নাটকের গদ্যসংলাপ বক্তৃতাধর্মী ও অলংকারধর্মী! সংলাপের কারণে নাটকের অনেক চরিত্রই ব্যর্থ হয়েছে এমন বলা চলে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিয়ারার সংলাপ এতই কাব্যধর্মী যে তাকে নাটকের সংলাপস্বরূপ গ্রহণ করতে সংশয় হয়—"আজ তবে এইরূপ নির্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে উঠুক; এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুটে নিক"। সাজাহান, ঔরংজীব, জাহানারা, পিয়ারা, দিলদার, মোরাদ প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে অভিশাপের ভয়াবহতা, মর্মান্তিক চিত্তবিক্ষোভ, যৌবনস্বপ্নের হৃদয়াবেগ ইত্যাদি প্রকাশিত। আলোচ্য নাটকের স্বগতোক্তি চরিত্রগুলির মনোজগতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অদ্বিতীয়। ঔরংজীবের নির্জন স্বগতোক্তি এক শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। যেমন—"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় উঠছে, একটা নদী পার হয়েছি; এ আর এক নদী ভীষণ কল্লোলিত, তরঙ্গসংকুল"। আলোচ্য স্বগতোক্তিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা, ঝড়ের সংকেতবাহিতা যেন প্রকাশিত। ঔরংজীবের বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব, জটিলতা, ষড়যন্ত্র, হৃদয়হীনতা, ক্ষমতার জন্য লোভ, কূটকৌশল ইত্যাদি সমস্তই তাঁর সংলাপে প্রকাশিত। একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, আত্মশক্তির উপর আস্থা ইত্যাদিও তাঁর সংলাপে অনুপস্থিত নয়। ঔরংজীবের একান্ত ভাষণ বা স্বগতভাষণ একান্তভাবে স্মরণীয়—"ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন? পতন? অসম্ভব; উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে?" ঔরংজীব তাঁর কৃতকর্মের জন্য, স্বজনদ্রোহিতার জন্য, ভ্রাতৃহত্যার জন্য বিন্দুমাত্র বিবেকদংশন অনুভব করেন না। তাঁর একান্ত ভাষণে মনে হয় ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় তাঁকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন—"আমার

হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা, আমি এ সিংহাসন চাইনি, তুমিই আমায় হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন?—তুমিই জান"। ঔরংজীব তাঁর আবেগপূর্ণ সংলাপের ভাষা সভাসদদের অভিভূত করেন। তাঁর সংলাপে কপট ধর্মধ্বজী, নৃশংস, ধূর্ত, ছলনাময় রূপ প্রকাশিত—"আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান না শাসন চান? বলুন, আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্তে পার্ব না। আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উশৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্বন না"।

নাটকে জাহানারা ব্যক্তিত্বময়ী রমণীরূপে অঙ্কিত। নাটকে তিনিই একমাত্র ঔরংজীবের প্রতিস্পর্ধিনী চরিত্র। তাঁর সংলাপ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, স্পষ্টবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি প্রকাশিত। জাহানারার কয়েকটি সংলাপের উদ্ধৃতি এই বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়। যেমন—১. "দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন। হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন"। ২. "আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্বিষহ অত্যাচার ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই"। দারার সংলাপে পরধর্মসহিষ্ণুতা, সুফীদর্শনের প্রতি অনুরক্তি, মহত্ত্ব, উদারতা, দার্শনিকতা, মানবতা ইত্যাদি প্রকাশিত। দিলদারের সংলাপ আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর ও কৌতুকমণ্ডিত মনে হলেও তাঁর সংলাপের পটভূমিকায় আছে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা। দিলদারের সংলাপ পরিহাসতরল, অসংলগ্ন মনে হলেও তাঁর সংলাপেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দর্শক-পঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেমন—"চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার সাধ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি"।

পিয়ারার সংলাপে তাঁর সুখী, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, পরিতৃপ্ত জীবনের রূপ প্রকাশিত। মাঝে মাঝে সংলাপে লঘু চপলতা থাকলেও সমস্ত অতিক্রম করে তাঁর দাম্পত্য জীবনের কবিত্বময় প্রবণতা সংলাপে প্রকাশিত। যেমন—"এই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনা পুষ্পগুলিকে প্রেমানন্দে মাখিয়ে নাও"। এই জাতীয় সংলাপ মাঝে মাঝে কৃত্রিম বলে মনে হয়। মহামারা চরিত্রের সংলাপে তাঁর আদর্শপ্রেমের তত্ত্ব, দৃপ্ত, তেজস্বিতা, ক্ষাত্রগর্ব, রাজপুতনীতি ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও, মাঝে মাঝে সংলাপে যেন সাজানো বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

'সাজাহান' নাটকের সংলাপে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও, কাব্যধর্মিতার প্রকাশ ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ বিষয়ানুগ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এ জাতীয় সংলাপ নাটকীয়ত্ব প্রকাশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা হলেও, 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক।

৪.৬ সঙ্গীত

সঙ্গীত নাটকের অন্যতম উপাদান এবং বহু প্রাচীনকাল থেকেই নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে গানের আধিক্য ঘটলে নাটকের রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে যাত্রা-র যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছে মূলত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য। নাটকের একঘেয়েমির মধ্যে নতুনত্ব সঞ্চারের জন্য, গম্ভীর বিষয়ের মধ্যে লঘুতা সঞ্চারের জন্য, দর্শকদের আনন্দ বিতরণের জন্য নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ রেখে 'সাজাহান' নাটকে সঙ্গীত যোজনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতগুলি কাব্যগুণান্বিত, গীতিরসেপূর্ণ। 'সাজাহান' নাটকে মোট ন'টি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-গীতি সাতটি এবং চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের একটি করে মোট দুটি বৈষ্ণবগীতি। এই ন'টি গানের মধ্যে সুজা পত্নী পিয়ারা পাঁচটি গান গেয়েছে। মোরাদের নর্তকী ও কাশ্মীরের নর্তকীরা দু'টি গান গেয়েছে। বাকি দু'টি গান গেয়েছে মহামায়ার চারণ বালক ও চারণী সহযোগীরা। বিষয়বস্তু অনুযায়ী 'সাজাহান' নাটকে প্রযুক্ত সঙ্গীত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত হতে পারে ঃ—(১) পিয়ারার সঙ্গীতগুলি প্রেমমূলক। (২) যোধপুরের চারণ-চারণীদের সঙ্গীতগুলি জাতীয় প্রেরণাময়। (৩) বৈষ্ণবগীতি।

'সাজাহান' নাটকের প্রথম সঙ্গীতটি পেয়েছে সুজা পত্নী ও সহ্গীতে পারদর্শিনী পিয়ারা—'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি'। সঙ্গীতটি প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সংযোজিত হয়েছে। মুজা-পিয়ারার দাম্পত্য প্রেমের করুণ মধুর সুর এখানে ধ্বনিত। পিয়ারা প্রকৃতি-প্রেমিক, সঙ্গীত বিভোর; আলোচ্য সঙ্গীত জীবনের ঋণত্বের বেদনা প্রকাশিত।—'এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর/হেথা কী দিব এ ভালোবাসা'। আলোচ্য সঙ্গীতটির যে আবেদন পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয় তা ক্ষণস্থায়ী নয়। জীবন যে ক্ষুদ্র, প্রেম যে ঋণস্থায়ী—সঙ্গীতের এই সত্য প্রমাণের জন্য নির্মম কামানের ভয়ংকর শব্দ জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর নষ্ট হয়ে যায়।

পরবর্তী সঙ্গীত দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে পিয়ারার কণ্ঠে গীত হয়েছে। সঙ্গীতটি জ্ঞানদাস বিরচিত বৈষ্ণবগীতি—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'। পিয়ারার প্রত্যাশা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—এ ভাবনাই এ গীতে প্রকাশিত। সুজাকে বার বার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে পিয়ারা ব্যর্থ হলে তার বেদনাহত মনোভাব আলোচ্য সঙ্গীতে ব্যক্ত।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিয়ারা দুটি গান গেয়েছে। দৃশ্যটির সূচনা হয় পিয়ারার সঙ্গীতে—'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি' এবং দৃশ্যটি সমাপ্ত হয় পিয়ারার গানে—'তুমি বাঁধিয়া কী দিয়ে. রেখেছ হৃদি এ'। খিজুয়ার শিবিরে বসে সুজা যখন একখানি মানচিত্র দেখছিলেন, তখন ফুলের একটি মালা হাতে করে পিয়ারা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে সুজার গলায় সেটি পরিয়ে দিল। এ সঙ্গীতে দাম্পত্য জীবনের সুখ পরিতৃপ্ত চিত্র প্রকাশিত। ঐ অঙ্কের সমাপ্তি দৃশ্যে পিয়ারার কণ্ঠে গীত 'তুমি বাঁধিয়া কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ' সঙ্গীতে প্রেমের মধুর মহিমা প্রকাশিত।

পিয়ারার সর্বশেষ সঙ্গীত গীত হয়েছে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদকক্ষে। আলোচ্য সঙ্গীতটি চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ—'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।' এ সঙ্গীতটির লক্ষ্য সুজার কন্যা ও জামাতা মহম্মদ। মহম্মদের সঙ্গে সুজার কন্যার বিবাহিত জীবন ঔরংজীবের কূটকৌশলে বিনষ্ট হতে চলেছে। এই বিচ্ছেদের আভাস সঙ্গীতটিতে থাকায় সঙ্গীতটি সুপ্রযুক্ত হয়েছে। সঙ্গীতটিকে প্রণয়মুগ্ধা রমণীর রূপ প্রকাশিত।

পিয়ারার পর 'সাজাহান' নাটকে মহামায়ার চারণ-চারণীদের স্বদেশি সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য। 'সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয়গৌরব ছিনি'—প্রথমাঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মহামায়ার চারণীদের কণ্ঠের প্রথম গান। সঙ্গীতটিতে আছে যুদ্ধজয়ের তীব্র বাসনা, সমর সঙ্গীতরূপে এটি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য সঙ্গীতে রাজপুত রমণীর ঐতিহ্য, আত্মবিসর্জন, স্বাধীনতা প্রিয়তা, দেশগরিমা ইত্যাদির স্তুতি করা হয়েছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে মহামায়ার আদেশে চারণ বালকগণের কণ্ঠে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি গীত হয়েছে। মনে হয়, আলোচ্য সঙ্গীতটির মাধ্যমে মহামায়া তাঁর দোলাচল চিত্ত দুর্বল স্বামীকে রাজপুতানার অতীত গৌরবে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন।

নাটকের বাকি দুটি গান নর্তকীদের কণ্ঠে গীত হয়েছে। নর্তকীদের নৃত্যলাস্য, দেহবিভ্রম ও সঙ্গীত উদ্দামতা দর্শকের মনোরঞ্জনে সহায়ক। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের মঞ্চ সফলতার জন্য দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মোরাদের নর্তকীদের কণ্ঠে 'আজি এসেছি বঁধূ হে' সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন। গানটি প্রমোদসঙ্গীত—এ যেন আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করে। এই সঙ্গীতটি নির্বোধ মোরাদের আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত করে।

তৃতীয়াঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে কাশ্মীরি নর্তকীদের 'ছোট্ট মোদের পানসী' গানটি অপেক্ষাকৃত লঘু রসের, এ গানের ভাষা লঘু, চটুল; জীবনসম্ভোগের আদিম আকর্ষণ, রূপযৌবনে প্রলুব্ধ করার ছলনা—এ গানে প্রকাশিত। মনে হয়, দর্শকদের সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন।

আলোচ্য নাটকে সঙ্গীতগুলি নাটকের আবেদনকে ব্যর্থ করেনি। নাটকে সঙ্গীত যোজনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক বোধ, রুচি, শিষ্টাচার ইত্যাদি প্রকাশিত এবং নাটকে প্রযুক্ত সঙ্গীতগুলি সার্থক ও সুন্দর।

৪.৭ চরিত্রবিচার

সাজাহান ঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় নাটক। নাটকীয় গতিময়তা, চরিত্রচিত্রণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি রূপায়ণে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটির নামকরণে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহান। নাট্যকার সাজাহান চরিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের বিষয়বস্তু হলো সাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়। প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট কীভাবে সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরই পুত্রের চক্রান্তে কারাগানে নিক্ষিপ্ত হলেন, সেই বিপর্যয়ের কাহিনি আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। সাজাহান চরিত্রের দুটি সত্তা—পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা। একদিকে তিনি দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ—এই চারপুত্র এবং জাহানারা, রৌশেনারা—এই দুই কন্যার পিতা। প্রথম সত্তা পরিবার ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে জড়িত; দ্বিতীয় সত্তা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ইতিহাসের পটভূমিতে সাজাহানের জীবনের বেদনা-দুঃখ-হাসিকান্না-সাফল্য-বর্থতা সমস্তই নাট্যকার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

ইতিহাস খ্যাত মহান চরিত্র সাজাহান ধীরে ধীরে আপন চরিত্রগত ত্রুটির জন্যে সমুন্নত মহিলা বিচ্যুত হয়েছেন। সাজাহানের ট্র্যাজেডিকে 'ট্র্যাজেডি অফ্ ক্যারেকটার' বলা যেতে পারে। মহান পতনের ফলে দর্শকের অন্তরে ভীতি ও করুণার ভাব জাগ্রত হয়; আর তারই রস পরিণতিতে ট্রাজিক রস অনুভূত হয়। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র' নাটকের কিং লিয়র চরিত্রে যেমন বিচার ক্ষমতার ত্রুটি লক্ষ করা যায়, সাজাহান চরিত্রেও তেমনি অবাঞ্ছিত দুর্বলতা লক্ষ করা যায় যা তাঁকে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। কিং লিয়রের মতোই সাজাহান অন্তর্নিহিত ত্রুটি-দুর্বলতা ও বিচার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যর্থতার জন্য ধীরে ধীরে মর্মান্তিক

পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। স্ববিরোধ ও কর্তব্যবুদ্ধির অস্থিরতায় সাজাহান ধীরে ধীরে আত্মক্ষয়ী হয়ে উঠেছেন। যেখানে কঠোর কর্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন সেখানে পুত্রদের তিনি স্নেহের শাসনে বদ্ধ করতে চেয়েছেন। সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি যে কঠোর হতে পারেন নি তাকে কর্তব্যজনিত চারিত্রিক ভ্রান্তি বলা যেতে পারে। এই ভ্রান্তির ছিদ্রপথে তাঁর জীবনে নেমে এসেছে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। মাঝে মাঝে জাহানারার পরামর্শে তাঁর অন্তরে কঠোর কর্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হলেও পুনরায় স্নেতাতুর পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে। সাজাহান উচ্চারণ করেছেন—"আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন।" ফলে বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে তাঁর সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সংগ্রাম সাজাহানকে দুর্বল করে ফেলেছে। পুত্রস্নেহের জন্যই তিনি ঔরংজীবের শঠতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। পুত্রস্নেহের আধিক্যহেতু তিনি ঔরংজীবকে আগ্রাদুর্গে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। আগ্রার দুর্গে তিনি যখন বিদ্রোহী পুত্রের হাতে বন্দি হলেন, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় তাঁর ব্যর্থ গর্জন করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

সমালোচ্য 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান চরিত্রের তিনটি পর্যায়ে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। নাটকের সূচনা থেকে আগ্রার দুর্গে বন্দি হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রথম পর্যায়। এই সময় পুত্রস্নেহ থাকলেও সম্রাট সত্তার জাগরণ অধিক। দ্বিতীয় পর্যায় ঔরংজীবের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ থেকে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করা পর্যন্ত। এখানে সাজাহানের সম্রাটসত্তা ক্ষণকালের বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় জ্বলে উঠেছে। তাঁর কাছে সম্রাট জীবিত থাকতে পুত্রের সিংহাসনে আরোহণ বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। এই বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য সাজাহান ক্রমশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে সুজার নিরুদ্দেশের সংবাদে, মোরাদের আসন্ন প্রাণনাশে এবং দারার পরাজয় ও বন্দিত্বের পরিণাণ আশঙ্কায় সাজাহান পূর্ণ উন্মাদ। এই উন্মাদ অবস্থাতেও তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্ব লক্ষ্যগোচর।

মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ তাঁকে দুর্বল করেছে। বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি কঠোর হতে না পারায় তাঁর স্নেহান্ধতা প্রকাশিত। কখনো কখনো তিনি উচ্চারণ করেছেন—'সাজাহান শুধু পিতা নয়, সম্রাটও'। সম্রাটের কর্তব্য পালন করতে গেলে পুত্রস্নেহে বিচলিত হওয়া চলে না—এই বোধ প্রথম দিকে জাগ্রত থাকলেও পরবর্তীকালে তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেছে। আগ্রার দুর্গে প্রবেশের অনুমতিদানকালে সাজাহানের আশা ছিল উদ্ধতপুত্রকে তিনি স্নেহের শাসনে বশ করবেন। কিন্তু পুত্রের হাতে বন্দি হলে সাজাহান সে ভুল বুঝতে পারলেন। আবার ঔরংজীব সম্পর্কে তাঁর গর্বও ছিল—'সে আমার উদ্ধত পুত্র, আমার লজ্জা, আমার গৌরব'। এখানে আবার সম্রাটসত্তাকে আচ্ছন্ন করে পিতৃসত্তার প্রকাশ।

দুটি সত্তার দোলাচলতায় সাজাহান দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র। সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষত-বিক্ষত সাজাহান পাঠক-দর্শকচিত্তে সমবেদনা, সহানুভূতির জাগরণ ঘটায়। সাজাহানের ন্যায় ট্র্যাজিক চরিত্র বাংলা নাট্যসাহিতে দুর্লভ।

ঔরংজীব ঃ

ঔরংজীব 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও, এবং তাঁর নামে নাটকের নামকরণ না হলে, তিনি যে প্রতিনায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র নাটকে সাজাহানের মত বিস্তৃততর মহিলা বা মহত্তম বিচ্যুতির প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত না হলেও নাটকে বার বার তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাহুবলে তাঁর নিপুণতা কম

হলেও বুদ্ধিবলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, কূটনৈতিক কলাকৌশল তাঁর স্বভাবগত। শক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা ছলে-বলে-কৌশলে তিনি কার্যসিদ্ধি করতে উৎসাহী। যশোবন্ত সিংহের অধীনস্থ মোগল সৈন্যদের তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে স্ববশে এনেছেন ও যুদ্ধজয় করেছেন। ঠিক এইভাবেই কৌশলের সাহায্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন তিনি।ষ লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। দক্ষতা, বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি তাঁর সহজাত। যে কোনো উপায়ে কার্যোদ্ধার করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল এবং নানা জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারতেন।

ঔরংজীব নীতিবাদী ছিলেন না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো পাপ ও অন্যায় কাজে তিনি নিযুক্ত হতে দ্বিধী বোধ করতেন না। মোরাদকে সুরাপানে নিয়োজিত রেখে বন্দি করতে দ্বিধা করেননি ঔরংজীব। নিজের সমস্ত পাপকার্যকে ঈশ্বরের নামে চালাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেও তিনি ধার্মিকের ভাণ করতেন। জহয়ৎ-এর সংলাপে ঔরংজীবের চরিত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয় ঃ "ভিতর এত ক্রূর, বাইরে এত সরল, ভিতরে এত প্রবল, বাইরে এত অস্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাইরে এত মধুর।" আর জাহানারার দৃষ্টিতে ঔরংজীব 'সৌম্য সহাস্য মনোহর পাষণ্ড'; 'ব্যাঘ্রের লোলুপ চাউনি চাইতে পারে'; আবার অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। ঔরংজীব নতুন শয়তানী মতবল করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে হাত জোড় করেন। কথায় কথায় মক্কায় চলে যেতে চান।

ঔরংজীবের চরিত্রের এটাই কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় নয়। তিনি অবিমিশ্র দুর্বৃত্ত নন। তাই তাঁর আচরণে মাঝে মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। চরিত্রাগত এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্য তিনি অনেকখানি মানবিক লক্ষণাক্রান্ত। বিবেকের ক্ষীণ পদধ্বনি তাঁর চরিত্রে মানবিক রস সিঞ্চন করেছে। দারার মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে তিনি বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়েছেন। নিজের মনকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তিনি বলেছেন, 'এ কাজীর বিচার, আমার অপরাধ কি?' দিলদারের কথায় ঔরংজীব যেন তাঁর বিবেকেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু ঔরংজীবের বিবেকী প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সাময়িক; ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি বিবেকের কাছে সত্য হতে চেয়েছেন। তাঁর শঠতা ও মিথ্যাচারিতা এতই প্রবল যে আপন পাপকার্যের সমর্থনে তুচ্ছতম যুক্তিও ঔরংজীব কাজে লাগিয়েছেন। বিবেকের দংশন আরও বেশি হলে ঔরংজীব চরিত্রটি আরও সজীব হয়ে উঠত।

তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে ঔরংজীব শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। দারার ছিন্ন শির, সুরাজের রক্তাক্ত দেহ, মোরাদের কবন্ধ ঔরংজীবকে অধীর করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর চিত্তগত প্রতিক্রিয়া দর্শক চিত্তে সহানুভূতি জাগায় নি।

শেষ দৃশ্যে শীর্ণ দেহে, পাণ্ডুর মুখে তিনি নতজানু হয়ে পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন—'আমি পাপী! ঘোরতর পাপী! সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। এই দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরাগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দেবে।'

সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। তাঁর শঠতা ও কপটতা মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করলেও তাঁকে গতিশীল ও জীবন্ত চরিত্র রূপে মেনে নিতে হয়। তাঁর আচার-আচরণ অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত ও আবেগবর্জিত; জাগতিক ভোগের প্রতি তাঁর কোনো স্পৃহা নেই। ঔরংজীব অত্যন্ত স্বার্থপর বলে নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে ভালবাসেন না। তিনি ছলনার দ্বারা মোরাদকে স্বপক্ষে এনেছেন, মোরাদকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন; যশোবন্ত সিংহকে সন্দেহ করে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন।

তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'ঔরংজীব তাঁর কার্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর আরও কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না'। জাহানারা কক্ষে প্রবেশ করলে দারার অসাধারণ কূটনৈতিক আচরণে সভাসদগণ বিস্মিত হন। সোলেমানের একটি উক্তি ঔরংজীবের যথার্থ পরিচয় বহন করে—'মানুষ এমন মৃদু কথা কইতে পারে আর এতবড় দুরাত্মা হতে পারে!' শেষ পর্যন্ত ঔরংজীব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অর্ধোন্মাদ পিতার মার্জনাও আদায় করে নিয়েছেন এবং 'সাজাহান' নাটকের স্মরণীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছেন।

দারা ঃ

সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ইতিহাসে উদারচেনা ব্যক্তি রূপেই চিত্রিত। তিনি পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তান স্নেহাতুর পিতা এবং প্রেমিক স্বামী ও কবি। সমস্ত প্রকার রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। দারার সঙ্গে অন্য ভ্রাতাদের, বিশেষত ঔরংজীবের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাঁর উদার ধর্মমতের জন্য ঔরংজীব তাঁকে ইসলামধর্ম বিরোধী 'কাফের' রূপে অভিহিত করেছেন। ইসলামের নামেই তিনি দারার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। দারা হিন্দু অনুরাগী ছিলেন বলে ঔরংজীব দারার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। দারা নমাজ বা রোজাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তিনি উপনিষদের ফারসী অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সাহিত্য শিল্প দর্শনের অনুরাগী ছিলেন।

দারা রাজনীতির পটভূমিতে লালিত পালিত হলেও কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। পিতা সাজাহান অসুস্থ হলে তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন এবং পিতার হয়ে ফরমান জারি করতেন। ঔরংজীবের অনুগতদের পদচ্যুত করে আপন শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। দারা পিতার সেবায় যেমন নিযুক্ত ছিলেন, তেমনি রাজধানীর কোনো চিঠি যাতে ভাইদের কাছে না পৌঁছয় সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

দারা উদার হলেও ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং স্বধর্ম ইসলাম ত্যাগ না করেও সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদার পটভূমি রচনার প্রচেষ্টা তাঁর অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল। তিনি সাম্রাজ্য চান নি; কেন না, তাঁর কথাতেই 'আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য পেয়েছি'। সমস্ত প্রজা ও সৈন্য দারার পক্ষে ছিল এবং তারা দারার জন্য বালকের মত ক্রন্দন করেছে। দারার মহত্ত্বে দিলদার বলেছেন—"একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গেছে।"

দারার সঙ্গে ঔরংজীব চরিত্রের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। ঔরংজীবের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় দারা বার বার পরাস্ত হয়েছেন। লোকচরিত্র অভিজ্ঞতা ও শাসন পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ঔরংজীবের সমকক্ষ ছিলেন না। পিতার অনুগ্রহে দারার রাজ্য লাভ ঘটেছে। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও মর্যাদা লাভ অত্যন্ত সহজে ঘটেছিল বলে তিনি শাসন বা সংগ্রামে, পররাজ্য আক্রমণে বা চক্রান্তে ঔরংজীবের সমান হতে পারেন নি। শাসন পরিচালনায় দমনপীড়ন করেন নি বলে সাধারণ মানুষের প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছেন দারা। তিনি পরিশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। নাদিরার মৃত্যুতে দারা বিচলিত হয়ে পড়লেও মৃত্যুকালে দারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

দারাকে কেন্দ্র করেই নাটকে করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে। দারা স্নেহ প্রেম বিজড়িত রক্ত মাংসের মানুষ; কিন্তু তাঁর মহৎ বৃত্তিগুলি জীবনে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। নাট্যকার সুকৌশলে দারার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে সুস্থ-সুকুমার বৃত্তিসম্পন্ন দারা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন তাতে

পাঠক-দর্শক তাঁর জন্য ভীতিমিশ্রিত করুণা ও শ্রদ্ধা বোধ করে। দারার মর্মান্তিক পরিণতিতে তারা বেদনাবিদ্ধ হয়।

দিলদার ঃ

চরিত্রের পরিচয় লিপিতে নাট্যকার দিলদারকে ছদ্মবেশী জ্ঞানী রূপে অভিহিত করেছেন। তবে এই চরিত্রটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তা সংশয়ের। অবশ্য ঔরংজীবের পরামর্শদাতাদের মধ্যে দানিশ মন্দ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন বলেন জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, দানিশ মন্দ খানের মোল্লা সাফিয়া-ই-আজাদী চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন। সাজাহান তঁআকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। সাত বছর পরে তিনি মীর বক্শী পদে উন্নীত হন। মসির-উল উমেরাতে বলা হয়েছে যে ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নাটকে পাই দিলদারের অনুরোধে ঔরংজীব দারার প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করতে প্রথমে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে শায়েস্তা খাঁর পরামর্শে তিনি মত পরিবর্তন করেন।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভিত্তি ব্যতীত অন্য কোনো তথ্য দুর্লভ এবং নামটিও নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে দিলদার আপন আত্মপরিচয়ে বলেছেন—'আমি গির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ'। ঔরংজীব বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করেছেন—'নিয়ামৎ খাঁ হাজী! এশিয়ার বিজ্ঞতম সুখী নিয়ামৎ খাঁ।' পরে দিলদার আপন পূর্ণ পরিচয় জানিয়ে বলেছেন—'আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ। শোনো আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, ... কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো।'

দিলদার বিদূষক সেজে ঔরংজীবের চাটুকারিতা করলেও তাঁর অনৈতিক কর্ম ও পাপের সমর্থন করেন নি। তিনি বিদূষকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বলেছেন—'ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম। বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমায় ফেরাতে পারবে না ঔরংজীব! আমি চল্লাম। মনে ভাবছ যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় না ঔরংজীব। এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি!—অধঃপতন? তুমি যত ভাবছো উঠছ, সত্য সত্যই তুমি ততই পড়ছো।' দিলদার যে কত স্পষ্টবাদী, সত্যদ্রষ্টা ও জ্ঞানী আলোচ্য উক্তিতেই তা প্রমাণিত। কোনো বিদূষক বা অনুগ্রহপ্রার্থীর পক্ষে এমন মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

দিলদার প্রথমে ছিলেন মোরাদের বিদূষক; কিন্তু মোরাদ দিলদারের অর্থবহ ব্যঙ্গের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। বার বার লঘু পরিহাসের মাধ্যমে তিনি মোরাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও নির্বোধ মোরাদ তা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু দিলদারের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাপ্রবণ উক্তির তাৎপর্য ঔরংজীব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দিলদার চাটুকার ছিলেন না বলে ঔরংজীবকে 'শঠ' বলতেও তাঁর দ্বিধা হয় নি। নিরপেক্ষ দর্শকরূপে থাকতে না পেরে তিনি ভ্রাতৃবিরোধে জড়িত হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা বোধ ও রহস্যাচ্ছন্নতা। দার্শনিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মৃত্যুও তাঁর কাছে মনোহর। তাঁর দার্শনিকতার ভিত্তি অনেক গভীরে বলেই কারাগারে বেশ পরিবর্তন করে দারাকে মুক্ত করে নিজেকে মৃত্যুমুখে

নিক্ষিপ্ত করতেও তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। তাঁর চরিত্রে কোমলতা, মাধুর্য ও মানবিকতা সমস্ত গুণই বিরাজিত।

ঔরংজীব মুগ্ধ হয়েছেন দিলদারের জীবনের প্রতি অনাসক্তি বোধে। দিলদারের মানসিক শক্তির কাছে ঔরংজীব পরাভূত। দিলদার চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—'দিলদার চরিত্রে ব্যক্তের সঙ্গে সহজগতি অপেক্ষা অব্যক্তের সঙ্গে নেপথ্যক্রিয়াই বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।' নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে দিলদার বলেছেন—'আমি মুখে মোরাদের বিদূষক, আমি হাস্য-পরিহাস করতে যাই, সে ব্যাঙ্গের ধূল হয়ে ওঠে। দিলদারের ভাঁড়ামিতে তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত মনোভাব প্রকাশিত। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দিলদার বিদূষকের ছদ্মবেশে পরিত্যাগ করে তাঁর সত্যস্বরূপ ঔরংজীবকে দেখিয়ে তাঁকে কঠোর তিরস্কার করেছেন। আপন সত্তাকে ক্রমপ্রকাশমান করে দিলদার 'প্রথমে পাঠক, তারপরে বিদূষক, তারপরে রাজনৈতিক, তারপের দার্শনিক' বলেছেন। চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে দিলদারের সংলাপে ঔরংজীবের বিবেকের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দিলদারের সংলাপে মৃত্যুবিলাসী দার্শনিকের প্রকাশ। অবশেষে পঞ্চমাঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আপন সত্য পরিচয় ঘোষণার পর দিলদারের বিদায় গ্রহণ।

দিলদার চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন। নাটকের গম্ভভীর পরিস্থিতি দিলদারের লঘু হাস্য পরিহাসে সুসহ হয়ে উঠেছে। তাঁর লঘু চপলতা ও হাস্য পরিহাসের পশ্চাতে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সাধারণ বিদূষকের সঙ্গে দিলদার চরিত্রের পার্থক্য এখানেই। কেউ কেউ তাঁকে শেক্সপীয়রের 'ফুল' চরিত্রের সঙ্গে ও গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিম চাচা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মোরাদ ঃ

সাজাহানের অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় মোরাদ চরিত্র বেশ কালিমাময়। তাঁর মধ্যে শাহজাদার সাহস ও বীরত্ব থাকলেও তা বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি তাঁর অসংযম ও ভোগলালসার জন্য। তিনি অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন বলেই ঔরংজীবের চাতুরীর কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছে। দিলদারের সংলাপে মোরাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মোরাদ 'মূর্খ', 'বর্বর', 'যুদ্ধোন্মাদ', 'সম্ভোগসজ্জিত'। শাসক হিসেবেও নির্বোধ, অবিবেচক, স্থূলরুচি সম্পন্ন, অসংযত জীবন যাপনে অভ্যস্ত। স্থূলবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলেই দিলদারের ব্যঙ্গ মিশ্রিত সতর্কবাণী তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর সাহস ও বীরত্ব থাকলেও নির্বুদ্ধিতা তাঁকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

মোরাদ চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। অর্থাগমের আশায় ও সৈন্য বৃদ্ধির জন্য একবার তিনি অরক্ষিত সুরাট নগর আক্রমণ করেন। সম্রাট সাজাহানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে ঔরংজীব যখন তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেন। এইখানেই তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আবার ঔরংজীব যখন তাঁকে বলেন যে, সিংহাসনে তাঁর লোভ নেই, তিনি ফকির হয়ে মক্কায় চলে যেতে চান এবং মোরাদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তখন মোরাদ সহজেই তাঁর ফাঁদে ধরা দেন। ঔরংজীবের কূটকৌশল বোঝার মত বাস্তবচেতনা তাঁর ছিল না। ধর্মাটের যুদ্ধে মোরাদ বীরত্বের পরিচয় দিলেও ঔরংজীবের প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা কমেনি। শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও ঔরংজীবের চক্রান্তে মোরাদ হত হন। একটি আত্মাভিমানে স্ফীত, অকর্মণ্য, ভোগবিলাসী ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন শাহজাদার জীবনের এই পরিণতি ঘটে।

সুজা ঃ

সম্রাট সাজাহানের মধ্যমপুত্র সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করলেও সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মানসিকতায় ক্রিয়াশীল ছিল। তবে সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করলেও তখনও সম্রাট নাম গ্রহণ করেন নি। সুজার বিদ্রোহ দমনের জন্য দারার পুত্র সোলেমান প্রেরিত হন এবং সোলেমানকে সাহায্যের জন্য দুজন সুদক্ষ সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ নির্বাচিত হন। সুজা সোলেমানের কাছে কাশীর সন্নিকটস্থ বাহাদুরপুরে পরাজিত হন। পরবর্তীকালে আর একটি যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে মীরজুমলার কাছে পরাজিত সুজা ঢাকার দিকে এবং পরে আরাকানে পালিয়ে যান। আরাকানের রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করলে আরাকানরাজ তাঁকে হত্যায় উদ্যত হন। সুজা জঙ্গলে পলায়ন করেন এবং সেখানে মগদের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সুজা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন এবং বাংলাদেশে দীর্ঘ কাল থাকার ফলে রাজ্য শাসনের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি বিলাসী হলেও মোরাদের মত বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। পিয়ারার মত প্রেমময়ী পত্নী থাকার ফলে তিনি অনেকাংশে সংযত ছিলেন। সুজার মধ্যে অনেক রাজকীয় গুণ যে সুপ্ত ছিল পিয়ারা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। একজন যোদ্ধার আচরণে যে দৃঢ়তার প্রয়োজন সুজার চরিত্রে তা ছিল না। তাঁর চরিত্রে যে একটি লঘু স্বচ্ছন্দ জীবনাবেগ ছিল, পিয়ারার সঙ্গে কথাবার্তায় উপলব্ধি করা যায়। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় সুজা-পিয়ারার দাম্পত্যালাপ, হাস্য-পরিহাস যেন নির্মল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দারা ও নাদিয়ার শোকাবহ দৃশ্যাবলীর সমান্তরালভাবে সুজা-পিয়ারার দৃশ্যাবলী স্থাপন করে নাটকে বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কাশীতে সৈন্য শিবিরে সুজা ও পিয়ারাকে প্রথম দেখা যায়। সুজার যুদ্ধ স্পৃহাকে পরিহাসের মাধ্যমে দমন করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। মুঙ্গেরের দুর্গ প্রাসাদে পিয়ারা নানাভাবে সুজা সংযত করার চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্যলোভের মোহ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কালিমা থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা পিয়ারার মধ্যে লক্ষ করা যায়। পিয়ারার পরম আকাঙ্ক্ষিত ছিল একটি সুখীদাম্পত্য জীবন। সুজাকে সে পথে পরিচালিত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পিয়ারার প্রেমে সুজার যুদ্ধোন্মত্ততা দূরীভূত হয়েছে। ঔরংজীব কর্তৃক বিতাড়িত সুজা আরাকানরাজের প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করলে সেখানে তাঁদের মধুর দাম্পত্য প্রেম আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। পিয়ারার প্রতি আরাকানরাজের আসক্তি প্রকাশিত হলে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে সুজা ও পিয়ারার জীবনে বিষাদময় পরিণতি দেখা দেয়।

জয়সিংহ ঃ

জয়পুরের মহারাজা, মোগলপক্ষের অনুগত জয়সিংহ সম্রাট সাজাহানের পতনে ও ঔরংজীবের অভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জয়সিংহ সাজাহানের বিশ্বস্ত সেনাপতি হলেনও ঔরংজীবের অভুত্থানের সময় তিনি কৌশলগতভাবে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্ভবন করেন এবং সুযোগ বুঝে ঔরংজীবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। নাট্যকার জয়সিংহের সুযোগসন্ধানী ভূমিকাটি নাটকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জয়সিংহ কোনো

অনুতাপ পোষণ করেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ জয়সিংহ শাসকের অনুগ্রহভাজন হওয়ার চেষ্টায় জ্যোতিষীর সাহায্যে যখন জানতে পেরেছেন যে, ঔরংজীবের উত্থান অনিবার্য তখন থেকেই ঔরংজীবের দিকেই হেলেছেন। তিনি রাজনীতিগতভাবে দূরদর্শী নন; ঘটনার গতি লক্ষ করে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যান। সেনাপতি দিলীর খাঁকেও তিনি আখের গোছানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

দারার চরম বিপর্যয়ের দিনে জয়সিংহ দারার অধীন হয়েও সোলেমানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন নি। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জয়সিংহের মনে কোনো গ্লানি নেই। অন্যতম সেনাপতি দিলীর খাঁ সোলেমানকে সাহায্য করলেও জয়সিংহ দ্বিধাহীন ছিলেন। জয়সিংহ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল স্বার্থসিদ্ধি। তাঁর কোনো স্বদেশচিন্তা বা নৈতিকতা ছিল না। নাটকে জয়সিংহ যেন কালিমালিপ্ত। জয়সিংহের মত চরিত্র চতুর ও অভিজ্ঞ ঔরংজীবের কাছে সম্পদ। তাই জয়সিংহকে দিয়ে তিনি যশোবন্ত সিংহকে প্রতিহত করার ষড়যন্ত্রে রত হন। জয়সিংহের সুহৃদবলে ঔরংজীব যশোবন্তকে ক্ষমা করতে চান ও কিছু উপঢৌকনও দিতে চান। এর ফলে জয়সিংহের আত্মাভিমান জেগে উঠল। জয়সিংহ ভাবলেন, ঔরংজীব তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে ঔরংজীবের কথায় বিগলিত জয়সিংহ যশোবন্তকে আন্তরিকভাবে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। যশোবন্ত স্বদেশপ্রেমের কথা বলে জয়সিংহ-যশোবন্ত ও রাজসিংহের মিলিত বাহিনীর দ্বারা মোগল বিতাড়নের স্বপ্নের কথা জয়সিংহকে জানান। কিন্তু জয়সিংহ তাঁকে বলেন যে, তাঁর পক্ষে ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানা সম্ভব হলেও জয়সিংহের প্রভুত্ব স্বীকার অসম্ভব। জয়সিংহ স্বজাতিদ্রোহিতা, সংকীর্ণতা, পদলেহিতার মূর্তিমান প্রতীক। জয়সিংহের নেই কোনো দেশপ্রেম, নেই কোনো দেশভক্তির আদর্শ, নেই অপরাধবোধের আত্মগ্লানি। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে ঘোষণা করেন—'আমি কোনো উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না, সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশি পাব, সেইখানেই যাব।' তাঁর পর—পদানত হওয়া, দালালি করা অনেক আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ। জয়সিংহ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ও ঔরংজীবের অনুগত দালাল রূপে নাটকে চিত্রিত।

যশোবন্ত সিংহ ঃ

সম্রাট সাজাহানের মিত্রস্থানীয় যোধপুর অধিপতি যশোবন্ত সিংহ দারার আদেশে মোরাদের বিদ্রোহ দমনার্থে প্রেরিত হন। কিন্তু সে যুদ্ধে ঔরংজীবের বুদ্ধিকৌশলে ও মোরাদের বীরত্বে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হন। ঔরংজীবের কূটকৌশলে কাফের যশোবন্ত সিংহ ও আধা-কাফের দারার বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মধ্যে এমন প্রচার করা হয় যে, তারা যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়। রাজপুত যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ যুদ্ধের শৌর্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে তিনি ঔরংজীবের কপটতা বুঝতে পারেন নি। রাজপুত চরিত্রের সরলতা, অকপটতা, নির্ভীকতা ও তার অহংকার একদিন যে যশোবন্তের পতনের কারণ হবে তা ঔরংজীব জানতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত যশোবন্ত দর্পহীন, গর্বহীন, অনুগত করদরাজে পরিণত হয়েছিলেন। সম্মুখ সংগ্রামে যশোবন্ত সিংহের পরাজয় তাঁর বীর্যবতী ক্ষত্রপত্নী মেনে নিতে পারেন নি; ফলে লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে পূর্ণ মহামায়া পরাজিত যশোবন্তের জন্য দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দুর্গদ্বার বন্ধের আদেশ দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যশোবন্তের আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। দিল্লিতে ঔরংজীব সম্রাট হয়ে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঔরংজীবকে সাহায্য করতে এসেছেন

সৈন্য দিয়ে। যশোবন্ত এর আগে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও বর্তমানে আবার ঔরংজীবের পক্ষে। কিন্তু রাজসভায় এলে বিরূপ মনোভাবাপন্ন যশোবন্ত প্রশ্ন করেছেন, কি অপরাধে সম্রাট সাজাহানকে বন্দি করে পিতা বর্তমান থাকতে ঔরংজীব সিংহাসনে বসেছেন? তাহলে যশোবন্ত কী ঔরংজীবের সম্রাট হওয়ার সংবাদ জানতেন না? আসলে যশোবন্ত সিংহ দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, দোলাচলচিত্ত। তাঁর মধ্যে সক্য স্থাপনের আনুগত্য জ্ঞাপনের ইচ্ছা যেমন প্রবল, তেমনি প্রবল রাজপুত দর্প। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ঔরংজীবের পূর্বেই পরিচয় ছিল এবং তিনি জানতেন যে, রাজপুত দর্পই একদিন যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের কারণ হবে। ঔরংজীব তাঁকে স্বপক্ষে গ্রহণের ইচ্ছা জানালে ও আনুগত্য দাবী করলে যশোবন্ত সিংহ রাজপুত দর্পের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি ঔরংজীবের দয়ার ভিখারী হতে আসেন নি; তিনি বাহুবলে সাজাহানকে মুক্ত করতে চান। যশোবন্ত একথা জানিয়েছেন যে, নর্মদাযুদ্ধে তিনি ঔরংজীবের বাহুবলের কাছে পরাস্ত হন নি; পরাজিত হয়েছেন শঠতার কাছে। এই যশোবন্তই আবার প্রকাশ্যসভায় জাহানারার অভিযোগের সমর্থনে ঔরংজীবের বিরোধিতা না করে ঔরংজীবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেন। যশোবন্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসম্মানের অভাব এবং ব্যক্তিত্বহীনতা।

নাটকের বেশ কয়েকটি দৃশ্য ধরে ধূর্ত ও কুচক্রী ঔরংজীবের কাছে যশোবন্ত একেবারে অনুগত রাজায় পরিণত হন। ঔরংজীবের শঠতা ও ছলনা ভুলে তিনি ঔরংজীবের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। অথচ যশোবন্ত সিংহ যদি খিজুয়া যুদ্ধে সুজার পক্ষে যোগ দিতেন তাহলে হয়তো ইতিহাস ভিন্ন পথে চালিত হতো। অব্যবস্থিতচিত্ত যশোবন্ত ঔরংজীবকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে সাহায্য করেছেন। যশোবন্ত শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান হারিয়ে পত্নী মহামায়ার অবজ্ঞা ও ধিক্কারের পাত্র হয়েছেন। তিনি রাজপুতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভ্রষ্ট, যোদ্ধার আদর্শ বিচ্যুত।ষ দুঃসাহসী নির্ভীক বীর স্বামী হওয়ার গৌরবও তিনি হারিয়েছেন। ঔরংজীবের রাজত্বে অন্যতম অধীনস্থ রাজা রূপে তিনি ইতিহাসে অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত।

জাহারানা ঃ

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের জাহানারা চরিত্র ব্যক্তিত্বের বালিষ্ঠতায়, যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতায়, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে, উপস্থিত আবেগে, কঠোরতায় কোমলতায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে জাহানারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনে করেন এবং তাঁর নামেই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত বলে মত পোষণ করেন। কিন্তু সমগ্র নাটক বিচার করলে জাহানারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যাবে না এবং তাঁর নামে নাটকের নামকরণ করা সঙ্গত বলে মনে হয় না। নাট্যকার জাহানারা চরিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের নির্দেশকেই মান্য করেছেন।

দারার সমর্থকরূপে জাহানারা পিতৃসিংহাসনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত। পিতাকে অগ্রাহ্য করে অন্য ভ্রাতাদের সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা তাঁর কাছে যথাযথ বলে মনে হয় নি। ফলে তিনি বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর এই প্রতিবাদের ফলে তাঁর চরিত্র শক্তি লক্ষ করা গেছে। সমস্ত বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্যে উন্নতশির জাহানারা বার বার সাজাহানকে তাঁর দুর্বলতা ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে বলেছেন। সাজাহানের প্রতি তাঁর এই অনুরোধ কিন্তু স্বার্থরক্ষার জন্য নয়; তাঁর এই অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি মনে করেন, পুত্র শুধুই পিতার স্নেহের অধিকারী নয়; তাকে শাসনও করতে হবে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কলুষতাপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে তিনি পিতার

আদেশমতই চলেছেন।

নাটকে জাহানারা কোথাও তাঁর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। তিনি সমস্ত বিপদের করালগ্রাস থেকে সাজাহানকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সাজাহানের জীবনে চরম বিপর্যয়ের দিনে জাহানারা একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি সাজাহানের সেবার যেমন নিয়তা, তেমনি আবার বলিষ্ঠভাবে সাজাহানের প্রেরণাদাত্রীও বটে। তিনি সাজাহানের মধ্যে বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—"এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পশুর মত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। * * * উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃত শাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন।'

জাহানারা যেভাবে প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ঔরংজীবকে সুকঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন তা তার অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। সত্য কথা মুখের উপর শুনিয়ে দিতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু জাহানারার সত্যনিষ্ঠা ঔরংজীবের কুটিল চক্রান্তে বার বার পরাজিত হয়েছে। তবুও ঔরংজীবের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। তাঁর বাক্‌পটুতা, সাহস, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর অসামান্য চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্যোতক।

সমগ্র নাটকে একমাত্র জাহানারাই দৃঢ়তার সঙ্গে সাজাহান ও দারার আপনাপন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। নাদিরার ভীরু মানসিকতাকে ধিক্কার জানিয়ে জাহানারা উচ্চারণ করেছেন—"নাদিরা, তুমি পয়ভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শংকাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।" জাহানারা চরিত্রের বলিষ্ঠতা, সম্রাট কন্যার মহিমা নাটকের আদ্যন্ত প্রকাশিত। নাটকে তিনি যেন বৃদ্ধ পঙ্গু সাজাহানের মুখপাত্র। তাঁর স্নেহ যত্ন ও মমতায় সাজাহান শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান নি। জাহানারা কোমলে কঠোর মিশ্রিত নারী; যেমন বাস্তবতা মণ্ডিত তেমনি সজীব চরিত্র। জাহানারা চরিত্রে নীচতা বা শঠতা ছিল না। জাহানারা সম্পর্কে সমালোচক সঙ্গতভাবেই বলেছেন—"তার ধীরতা, বাস্তববুদ্ধি, চারিত্রিক স্নিগ্ধতা, দৃঢ়তার চরম পরীক্ষা ঘটেছে অন্তিম দৃশ্যে সাজাহানের অনুরোধে ঔরংজীবের প্রতি ক্ষমাবাক্য উচ্চারণে। হত্যা, সন্দেহ, চক্রান্ত, কৃতঘ্নতা, অবিশ্বাসের নিত্য আবর্তমান ঘূর্ণির কেন্দ্র মোগল অন্তঃপুরে যার আশৈশব অধিষ্ঠান, শোণিতধারার মধ্য দিয়ে যে সহজে তৈমুর বংশের দোষগুণ লাভ করেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যার জীবন সাজাহানের রাজত্বকালে জড়িয়ে গিয়েছিল, সে যে কেমন করে নারীসুলভ শুচিতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা এবং সেবা শুশ্রূষা ও আত্মত্যাগের শ্লাঘনীয় বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দেয় নি তা ইতিহাসের বিস্ময়। নাটকেও এই জাহানারাকেই নাট্যকার স্থান দিয়েছেন।

নাদিরা ঃ

'সাজাহান' নাটকের নাদিরা চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও রচিত; কেননা নাদিরার চরিত্র চিত্রণে ইতিহাস নাট্যকারকে কোনো সাহায্য করে নি। নাদিরা দারার যোগ্য সহধর্মিনী; দারা যেমন ধর্মপ্রাণ, উদার, মহৎ, অসাম্প্রদায়িক, ক্ষমতানিস্পৃহ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, তেমনি নাদিরাও ধর্মপরায়ণা, প্রেমশীলা, স্নেহময়ী, স্বামিগতপ্রাণা। তাঁর মধ্যে নেই সম্রাজ্ঞীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা অহমিকা; সিংহাসন অপেক্ষা অনুদ্বিগ্ন জীবনই তাঁর কাম্য। সমস্ত

দুঃখদুর্দশা তিনি শান্ত সহিষ্ণু চিত্তে মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তিনি বীর, সাহসী, যুদ্ধকুশলী জাহাঙ্গীরের পৌত্রী হলেও তিনি কোমল, স্নেহবৎসল, মমতাময়ী এবং প্রেমব্যাকুল।

নাটকের সূচনাতেই দুঃস্বপ্ন দর্শনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসন্ন যুদ্ধে দারার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি শংকায় আকুল। তিনি সে আশঙ্কা জাহানারার কাছে ব্যক্ত করলে জাহানারা লতাঁকে তিরস্কার করেছেন। দারার যুদ্ধে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে তিনি অনাগ্রহী; মমতাময়ী নারীর কাছে স্বামীর জীবন অনেক মূল্যবান। স্বপ্নে দেখা নাদিরার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টায় দারা বার বার ব্যর্থ, পর্যুদস্ত ও পরাভূত, পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন ব্যতীত তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই। সম্রাট সাজাহান মনোনীত ভারতসম্রাট ও তাঁর পত্নীর দুর্ভাগ্য, লাঞ্ছনা এ বেদনাপীড়িত জীবনযাত্রার শুরু হলো। অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করেও নাদিরা বিচলিত হন নি। আশ্রয়হীনা, নিদ্রাহীনা নাদিরা অসম্মানের, অপমানিতের জীবন যাপন করলেও মুহূর্তের জন্যও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেন নি। আর এই হল অনুরক্তা, প্রেমমুগ্ধা নাদিরার মহত্ত্ব ও গৌরব। অসহনীয় দুঃখদুর্দশায় দারা মানসিক ভারসাম্য হারালে নাদিরা আপনমৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন; এমনকি দারা তাঁকে হত্যায় প্রবৃত্ত হলেও নাদিরা বাধা না দিয়ে. ঈশ্বর-প্রার্থনায় নিরত হয়েছেন।

বিতাড়িত, পর্যুদস্ত দারা পলাতক অবস্থায় আমেদাবাদে পুত্রকন্যা, স্ত্রীসহ উপনীত হলে নাদিরা স্বামীর অস্থিচর্মসার ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে দুঃখবিদীর্ণ হয়েছেন। অশ্রুসংবরণে ব্যর্থ হয়েছেন। নাদিরার মুখে দারা তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য ও শীর্ণদেহের কথা শুনে নাদিরাকে ভুল বুঝে কর্কশ কণ্ঠে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করলে নাদিরা ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুপ্রার্থনা করলেন। আত্মধিক্কারে, বেদনায়, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেও নাদিরার প্রেমানুরক্তি লোপ পায় নি। অবশেষে নানা বিপর্যয়ের ফলে নাদিরার জীবনদীপ নির্বাপিত প্রায়; দীর্ঘকাল জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমানকে দেখেন নি। তবুও স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেম দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল; তিনি অভিযোগে কখনও উচ্চকণ্ঠ নন। নাদিরার জীবনদীপ শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হয়েছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীর কুৎসিত কৃতঘ্নরূপ তাঁকে দেখে যেতে হয় নি। নাদিরার মত নারী মোগলবংশের ইতিহাসে দুর্লভ; হত্যা-মৃত্যু-ষড়যন্ত্র কৃতঘ্নতার পরিবেশে নাদিরা শোকাময়ী, প্রেমকাতরা, কর্তব্যপরায়ণ নারীরূপেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পিয়ারা ঃ

'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহানের মধ্যম পুত্র সুজার পত্নী পিয়ারা দারার পত্নী নাদিরার সমগোত্রী চরিত্র। সমগ্র নাটক যখন ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন পিয়ারা সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত চরিত্র। পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ সততায় পিয়ারা চরিত্র স্মরণীয়। তবে বহিরঙ্গ জগতে নাদিরা ও পিয়ারার চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্যগোচর। নাদিরা গম্ভীর ধীর স্রোতস্বিনী; পিয়ারা উচ্ছল নির্ঝরিণী। পিয়ারা হাস্যচ্ছটায়, কৌতুকে জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণাকে সহ্য করেছে। পিয়ারাকে আপাতদৃষ্টিতে লঘু চরিত্র মনে হলেও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময় তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা লক্ষ্য করা যায়। পিয়ারা তার অন্তরের সুগভীর প্রেম-প্রীতি ও মমতা দিয়ে. যুদ্ধের উন্মাদনা থেকে সুজাকে অন্তরালে রেখেছে। পিয়ারা হাস্যে-পরিহাসে, কৌতুকে,

উচ্ছলতায়, সঙ্গীতে পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে ভুলে থাকার জন্য পিয়ারা অর্থহীন প্রগলভতার আশ্রয় গ্রহণ করে। তার চরিত্রে ছলনা, মিথ্যাচারিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত। পিয়ারা বাস্তব পরিবেশে নেমে আসতে চায় না। সুজা পিয়ারার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পায় না; সে তাকে 'এক হাস্যের ফোয়ারা এক অর্থশূন্য বাক্যের নদী' মনে করে। কিন্তু পিয়ারা তাতে ক্ষুন্ন হয় না। প্রেমের অসামান্য শক্তি তাকে সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছে। সুজার বিপর্যয়ে পিয়ারার চিত্ত হাহাকার করে উঠলেও সে কৌতুকে-পরিহাসে সমস্ত মর্মবেদনাকে গোপন করে রেখেছে। বাইরের দিক থেকে পিয়ারাকে লঘু, চটুল বলে মনে হলেও সে আসলে হালকা ধরনের চরিত্র নয়। মর্যাদাবোধ ও প্রেমশক্তি তাকে মহিমাময়ী নারীতে পরিণত করেছে। বহিরঙ্গ চপলতার অন্তরালে ছিল অসামান্য দৃঢ়তা। আর এই দৃঢ়তা আরোপিত নয়, স্বাভাবিক। পিয়ারা প্রেমময়ী হলেও শক্তিময়ী।

পিয়ারার কুসুম-কোমল হৃদয় প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠিন হয়ে উঠত। পিয়ারার জীবন-নাট্যে হিংস্র চক্রান্ত, স্বার্থপরতা, হত্যা, মৃত্যু, ষড়যন্ত্র উত্তীর্ণ এক নির্মল আলোকোজ্জ্বল আকাশের প্রতিফলন। প্রেমের সাধনাতেই তার জীবনের সার্থকতা। যুদ্ধের বিরোধিতা তার স্বভাজজাত হলেও প্রয়োজনে সুজাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রেরণাদানও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এ সমস্ত সম্ভব হয় প্রেমের শক্তি থেকে। পিয়ারা রূপে, কণ্ঠে, সঙ্গীতে, রসিকতায়, উচ্ছলতায়, উদ্বেলতায় 'সাজাহান' নাটকে যেন এক অপার্থিব চরিত্র। ঘনান্ধকার মৃত্যুর অন্ধকারে পিয়ারা মর্ত্যভূমিতে অনাবিল প্রাণের এক উজ্জ্বল দীপশিখা।

মহামায়া ঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে মহামায়া চরিত্র যেন অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। আসলে, আলোচ্য নাটকে মহামায়া যে গুরুত্ব লাভ করেছে তা বোধহয় সঙ্গত নয়। মহামায়া যশোবন্ত সিংহের বীরাঙ্গনা পত্নী, তিনি স্বামীর দলত্যাগে ক্ষুব্ধ, সর্বোপরি বিশ্বাসঘাতকতায় বেদনার্ত। আলোচ্য নাটকে মহামায়া নাট্যকারের দ্বারা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেলেও তাঁর ভূমিকা যে অনেকটাই অপ্রোয়জনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয়, নাট্যকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে নাটকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে স্বদেশপ্রেম, দেশচেতনা ইত্যাদি প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। অথচ তার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে—এমন ধারণা থেকেই নাটকে মহামায়া চরিত্রের গুরুত্ব। ঔরংজীবের সময়ে হিন্দু রাজাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অবসান আসন্ন, অথচ নাটকে কোনো সূত্রে দর্শকমনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত ও স্বদেশানুরক্তি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। মহামায়া ও চারণীদের কণ্ঠে স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত সঙ্গীত পরিবেশনে চরিত্রটির সার্থকতা নিহিত বলে মনে হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৫৮-র এপ্রিল মাসে ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরংজীব ও মোরাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে সাজাহান ও দারার পক্ষে সেনাপতি যশোবন্ত পরাজিত হন। তবে সে পরাজয় শৌর্যবীর্যের পরাজয়, না কূটকৌশলের কাছে পরাজয় তা বিচার না করে যশোবন্ত-পত্নী মহামায়া পরাজিত সেনাপতিকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে না দিয়ে দুর্গদ্বার বন্ধের আদেশ প্রদান করেন। এইভাবেই মহামায়া চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়; নচেৎ সাজাহান নাটকের পটভূমিকায় যোধপুর দুর্গের কোনো ভূমিকাই নেই। যশোবন্তের পরাজয় ওতার গ্লানি

মহামায়াকে স্পর্শ করে; তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"ক্ষত্রিয় বীর তুমি— ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছ! জানো সমস্ত রাজপুতানা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে।"

মহামায়া চরিত্রে রাজপুত রমণীর তেজ, বীর্যবত্তা, ক্ষাত্র অহংকার ইত্যাদির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মহামায়া মূর্তিমতী স্বদেশচেতনা বলে স্বামীর দুর্বলতা, কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি সহ্য করতে পারেন না। যশোবন্ত পত্নী মহামায়াকে আনুগত্যময়ী নারীশরীর ভাবলেও মহামায়ার চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্বামীকে আদর্শবাদী মানুষরূপে দেখতে চান। তাঁর মতে—'ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না। দিন দিন প্রিয়তম করে।' মহামায়া চরিত্রে আদর্শ-দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব ও দেশপ্রেমের গৌরব প্রতিফলিত। তিনি শুধু বীররমণী বা বীরজায়া নন; তিনি দেশপ্রেমিকা। স্বদেশের মৃত্তিকা, পাহাড়, অরণ্য সমস্তই তাঁর কাছে মহিমামন্ডিত—"চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ, চেয়ে দেখ—ঐ পর্বত স্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য কাঁপছে।" তিনি মেবার মাড়বারের গোধূলি আলোকে শেষ বারের মত উদ্দীপক দেশপ্রেমের সঙ্গীতটি গেয়েছেন চারণ—বালকদের সঙ্গে—'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' মহামায়ার দেশপ্রেম, দৃপ্ত তেজ, ব্যক্তিত্ব, ক্ষাত্রমহিমা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে অনেকের কাছে প্রেরণার সঞ্চার করে।

৪.৮ অনুশীলনী

১। 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার করুন।

২। 'সাজাহান' নাটকের নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।

৩। 'সাজাহান' নাটকের নায়ক সাজাহান।—মন্তব্যটি সঠিক কিনা বলুন।

৪। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ চরিত্রানুযায়ী যথাযথ।—আলোচনা করুন।

৫। 'সাজাহান' নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৬। চরিত্র বিচার করুন ঃ সাজাহান, ঔরংজীব, জাহানারা, দিলদার, সুজা, মোরাদ, পিয়ারা।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস ঃ অজিতকুমার ঘোষ

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার ঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।

৪। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) ঃ ভূদেব চৌধুরী।
৬। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, প্রথম খণ্ড ঃ পুলিন দাস।
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ঃ সুকুমার সেন।